প্রফুল্লচন্দ্র সেন

প্রফুল্লচন্দ্র সেন

(জীবনী ও ভাবধারা)

সম্পাদনা

সুকুমার দত্ত

নবজীবন

প্রকাশক :
সুকুমার দত্ত

'নবজীবন'
১০ ক্লাইভ রো, কলিকাতা-১

মুদ্রাকর :
এন, কে, গোসেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
৭/১, গ্র্যাণ্ট লেন, কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

দাম : দু' টাকা

প্রথম প্রকাশ :
১০ই এপ্রিল ১৯৬৩

উৎসর্গ

বাংলার তরুণসমাজকে

ভূমিকা

প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষে এই পুস্তকটি প্রকাশ করা হোল। মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্রের পরিচয় কিছু লোক জানেন, কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধা প্রফুল্লচন্দ্র—যিনি গভীর দেশাত্মবোধ আর দুর্গত পল্লী-বাসীর ওপর অসীম মমত্ব নিয়ে পূর্ণ আত্মত্যাগের প্রেরণায় নিভৃত পল্লীতে সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার মধ্যে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট বরণ করে দিন কাটিয়েছেন সেই আমাদের অতি আপন প্রফুল্লদার পরিচয় এখনও কয়েকজন অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের মধ্যেই নিবদ্ধ। সেজন্য তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী বা চরিত্রালোচনা এই পুস্তকে দেওয়া হোয়েছে। আর দেওয়া হোয়েছে প্রফুল্লচন্দ্রের এমন কয়েকটি রচনা যা দিয়ে তাঁর ভাব-ধারার সংগে জনসাধারণ পরিচিত হতে পারবেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা একাধারে গঠনমূলক ও বিপ্লবাত্মক। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই আমাদের বাংলা-দেশ যাতে ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হোতে পারে সেজন্য তিনি সকলকে ধীরমস্তিষ্কে একতাবদ্ধ হয়ে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হোতে বলেন। সেই সংগে তিনি আরও বলেন যে, দুঃখ-দারিদ্র-সমস্যাসঙ্কুল পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি কেবলমাত্র পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রের উদ্যোগে সম্ভব নয় এরজন্য চাই বিপ্লব, মহান সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব; রামকৃষ্ণ ও শ্রীঅরবিন্দের পূণ্যভূমি বাংলা দেশে আধ্যাত্মিক বিপ্লবও যে ঘটবে সে সম্বন্ধেও তিনি গভীর বিশ্বাস পোষণ করেন। সর্বোত্তম আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত সর্বাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাংলাদেশকে নূতন পথে চালনার জন্য তিনি যে ব্রতী হোয়েছেন, তার ফলে বাঙ্গালীর মনে প্রাণে এক নূতন আশার সঞ্চার হোতে চলেছে।

প্রফুল্লচন্দ্রের যে কয়েকটি রচনা এখানে দেওয়া হোয়েছে তাতে তাঁর উদাত্ত আহ্বান ভালভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে করি। আশাকরি জনসাধারণ, বিশেষ করে বাংলার তরুণ সমাজ এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হোয়ে বাংলাদেশের নবজীবনের পরিকল্পনায় সহযোগিতা করতে অগ্রসর হবেন।

সুকুমার দত্ত



প্রফুল্লচন্দ্র সেন

জন্ম ১০ই এপ্রিল ১৮৯৭

প্রফুল্লচন্দ্র সেন

সংক্ষিপ্ত জীবনী

বাঙালী প্রাণধর্মের সাধক। তার জীবন-সাধনার একটা নিজস্ব ধারা আছে। সেই ধারাটি বুঝতে না পারলে বাঙালীর দেশচর্যার মহিমা সহজে উপলব্ধি করা যায় না। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে সর্বপ্রথম এই জীবন-সাধনার আদর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরলেন।

"আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

উত্তর হইল—"তোমার পণ কি?"

"পণ আমার জীবন-সর্বস্ব।"

"জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে? আর কি দিব?"

তখন উত্তর হইল—"ভক্তি"।

আনন্দমঠের স্বামী সত্যানন্দ দেবীর চরণে প্রাণ বলি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রাণ বলিদানের চেয়ে মায়ের সেবায় সমগ্র জীবনব্যাপী সেবা ও আত্মোৎসর্গ শ্রেষ্ঠতর। তাই প্রাণ বলিদানের প্রতিশ্রুতিতে তৃপ্ত না হোয়ে দেবী চেয়েছিলেন ভক্তি। দেশাত্মবোধের জীবন্ত বিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠেও আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ আদর্শেরই প্রতিধ্বনি শুনলাম—"আগামী পঞ্চাশৎ বৎসর ধরিয়া জননী জন্মভূমি তোমাদের আরাধ্যা দেবী হউন।" তারপর স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি, শ্রী অরবিন্দ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বাঙালী তরুণদের সামনে দেশপ্রেমের এক নূতন ব্যাখ্যা দিলেন। লিখলেন তাঁর *The Ideal of Karmoyogin* গ্রন্থে: "Our aim will therefore be to help in building up India for the sake of humanity—this is the spirit of nationalism which we profess and follow, We believe that God is with us and in that faith we shall conquer. We shall devote ourselves not to politics alone, not to social questions alone, but we include all these in our entity which we believe to be all important, the *dharma*, the national religion which we also believe to be universal."

বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-অরবিন্দ প্রদর্শিত জাতীয়তাবোধের পথই বাঙলার দেশসেবকগণ অকুণ্ঠচিত্তে অনুসরণ করে দেশসেবার এক অভিনব আদর্শ ভারতবাসীর কাছে তুলে ধরেছেন। প্রফুল্ল চন্দ্র সেন সেই পথেরই একজন পথিক এবং এ যুগের প্রাণসাধকদের মধ্যে অন্যতম। হৃদয়ের স্বর্ণপাত্রে অকৃত্রিম দেশভক্তিকে ধারণ করেই একদা তিনি উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় জীবনের সর্বসুখে জলাঞ্জলী দিয়ে দেশমাতৃকার আহ্বানে দেশের কাজে নেমেছিলেন। সেদিন তাঁর স্থান ছিল কর্মীদের তালিকায়—আজো তিনি একজন কর্মী ও দেশসেবক হিসাবেই পরিচিত। নেতৃত্বের অভিমান বা মোহ তাঁর কর্মের ক্ষেত্রকে আবিল করে তোলেনি কোনোদিন। এমনকি, কলরব মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে তিনি তাঁর কর্মের আসন পাতেননি কোনোদিন। এক বিরল নিষ্ঠা এবং মমত্বপূর্ণ অনুরাগ ও আকুতি নিয়ে তিনি দেশসেবার দুশ্চর পথে বিচরণ করে চলেছেন। কর্মের ও সেবার মহিমায় ভাস্বর তাঁরই জীবনে আমরা লক্ষ্য করি আদর্শ ও সাধনার সঙ্গে জন্মভূমি—প্রেমের সহজ সমন্বয়। এ কথা আজ নিঃসঙ্কোচেই বলা চলে যে, অহিংস অসহযোগের মন্ত্রে যে জীবন একদিন উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, দেশ ও জাতির উন্নতি ও কল্যাণের জন্য ধাপে ধাপে সেই জীবন চরিতার্থতার পথে সমুত্তীর্ণ হয়েছে। বাঙালীর বর্তমান জীবনে প্রফুল্ল চন্দ্র সেন আজ শুধু একটি ব্যক্তিমাত্র নন—তিনিই এখন নানা সমস্যাপীড়িত এই জাতির জীবনে প্রেরণা এবং আশার প্রতীকস্বরূপ হোয়ে দাঁড়িয়েছেন। সত্যকার দেশপ্রেম যে উচ্ছ্বাস নয়, জনতার জয়ধ্বনি যে দেশসেবকের কাম্য নয়, হৃদয়-সিংহাসনে দেশমাতৃকাকে আরাধ্যা-দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করে জীবন-অর্ঘ্যকে তাঁর চরণে ভক্তিসহকারে নিবেদন করে দিয়ে দেশসেবার তপস্যাকে বরণ করতে হয়—প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সুদীর্ঘ জীবনেতিহাসের ইহাই তো প্রধান কথা আর এই কথাটাই আজ আমাদের যেন বিশেষ করে মনে পড়ে।

প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের কথা তাঁর অন্তরঙ্গস্থানীয়দের মধ্যে সুপরিচিত। কি পরিবেশের মধ্যে তিনি, আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পূর্বে দেশসেবার পথ বেছে নিয়েছিলেন, সে কাহিনীও অল্প-বিস্তর সকলেরই জানা আছে। তখন ভারতের রাজনীতিতে শুরু হয়েছে পট পরিবর্তন—দেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন কটিবাসপরিহিত কৃশকায় একটি মানুষ। তিনি মহাত্মা গান্ধী। ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস তখন এই মানুষটিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবার জন্য উন্মুখ। সারা দেশে চলেছে অসহযোগ আন্দোলনের বিরাট প্রস্তুতি। ইতিহাস স্পন্দিত হোয়ে উঠেছে এক নূতন চেতনায়। কৃতবিদ্য যুবক প্রফুল্লচন্দ্র তখন বিলাতে চার্টার্ড একাউণ্ট্যান্সী পড়তে যাবেন মনস্থ করেছেন। পাশ-পোর্টও প্রস্তুত। তখন ভারতের আকাশে-বাতাসে রণিত হোয়ে উঠেছে গান্ধীজীর অসহযোগ মন্ত্র। সে মন্ত্রে মেতে ওঠে দেশের তরুণদল। মেতে উঠলেন প্রফুল্লচন্দ্রও। তখন তাঁর মনে জাগলো দ্বিধা, উঠলো প্রশ্ন। কি করবেন তিনি?—জীবনের উচ্চাকাঙ্খা চরিতার্থ করবার জন্য

বিলাতে যাবেন, না দেশমাতৃকার বন্ধন মুক্তিকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করবেন? বঙ্কিম-বিবেকানন্দের বাণী চকিতে বিদ্যুৎঝলকের মতো মানসপটে উদ্ভাসিত হোয়ে ওঠে—মুহূর্তে কর্তব্য স্থির হোয়ে যায়। দেশের সেবায় যাঁরা জীবন উৎসর্গ করে থাকেন, তাঁদের জীবনে এই-রকমই ঘটে থাকে। দুঃখ ও ত্যাগের কণ্টকময় পথেই তাঁদের স্বচ্ছন্দ বিচরণ, ব্যক্তিগত সুখ বা স্বার্থের হিসাব এই শ্রেণীর মানুষেরা কোনো-দিন রাখেন নি, রাখতে পারেন না। বাঙালীর জীবনসাধনার ইহাই রীতি—তার দেশসেবার বৈশিষ্ট্য ইহাই।

প্রফুল্লচন্দ্র ঝাঁপ দিলেন অসহযোগ আন্দোলনে। হুগলী জেলার আরামবাগ হোল তাঁর কর্মস্থল। দ্বারকেশ্বরের ভৈরব বন্যায় আরামবাগ তখন বিপর্যস্ত—স্থানীয় অধিবাসীর অপরিসীম দুর্দশা। কর্মের ক্ষেত্র খুঁজে পেলেন তরুণ দেশসেবক। রাজনীতি নয়—সেবা। বস্তুতঃ প্রফুল্লচন্দ্রের কর্মজীবনের উদ্বোধন মানবসেবার ভিতর দিয়ে হয়েছিল বলেই না তিনি রাজনীতি-সর্বস্ব মানুষ হোয়ে ওঠেননি। তাঁর চরিত্রের এইটাই তো বড়ো বৈশিষ্ট্য। তাঁর দরদী হৃদয় আর্ত-মানবতার দুঃখে কেঁদে উঠলো। তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করে দুর্গতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। সেই যে তিনি আরামবাগে গেলেন, আর ফিরলেন না। অতঃপর আরামবাগ আর সমগ্র হুগলী হোয়ে উঠলো প্রফুল্লচন্দ্রের কর্মসাধনার কেন্দ্র। সে সাধনার ইতিহাস বিরাট ইতিহাস। "একটি সংগঠনকেন্দ্র গড়িয়া তোলেন বড়ডোঙ্গলে। তাঁহাদেরই এক নিষ্ঠাবান সহকর্মীর নামে স্থাপন করেন 'সাগর কুটীর'। সেখানে থাকিয়া আশেপাশের দুঃস্থ জনগণের মধ্যে খদ্দর প্রচার করেন। কুটীরশিল্পের মাধ্যমে তাহাদের স্বাবলম্বী করিয়া তোলার চেষ্টা করেন। সেই সময়ে আরামবাগ ছিল ম্যালেরিয়া ও কালা-জ্বরের ডিপো। শুধু আরামবাগ নয়—সমগ্র হুগলী জেলাই তখন এই মারাত্মক ব্যাধির কবলে। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহারই মতো হৃদয়বান ও পরদুঃখকাতর একজনকে তাঁহার পার্শ্বে পাইলেন। তিনি হরিপালের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডাক্তার আশুতোষ দাস—সকলের প্রিয় 'আশুদা'। চিকিৎসায় যেমন, সংগঠন কাজেও তেমনি অসাধারণ নিষ্ঠা ও নৈপুণ্য ছিল আশুতোষের। ইঁহারই সহকর্মীরূপে প্রফুল্লচন্দ্র কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া-পীড়িত জনগণের সেবাকার্যে নিজেকে নিয়োজিত করেন। কর্মনিষ্ঠ আশুতোষ কয়েক বৎসর পূর্বে পরলোকগমন করেন। আজো প্রফুল্লচন্দ্র শতকাজের মধ্যেও তাঁর মৃত্যু দিবসে হরিপালে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সেই নিষ্ঠাবান ত্যাগব্রতী সহকর্মীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া আসেন। ঐ সময় হইতেই তিনি নিয়মিত চরকায় সতা কাটিতে শুরু করেন। সম্প্র সূতা কাটায় প্রফুল্লচন্দ্র সিদ্ধহস্ত।"

তাঁর আরামবাগ জীবনের ইহাই কিন্তু সব কথা নয়। কিভাবে তিনি গ্রামের গরীব-দুঃখীদের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিলেন, বিনা মশারিতে রাতের পর রাত গায়ে কেরাসিন তেল মেখে ঘুমিয়ে তাদের

দুঃখের অংশ গ্রহণ করেছেন—এসব কাহিনী আজ কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়েছে। কিভাবে নিঃস্বার্থ ও নিরবচ্ছিন্ন সেবার ভিতর দিয়ে কর্মী প্রফুল্লচন্দ্র 'আরামবাগের গান্ধী' এবং আপামর জনসাধারণের 'প্রফুল্লদা' হোয়ে উঠলেন, সে কাহিনীও আজ সুপরিচিত। একদা বরিশালকে কেন্দ্র করে অশ্বিনীকুমার দত্ত যেমন তাঁর বিস্ময়কর কর্মজীবন গড়ে তুলেছিলেন এবং বরিশাল থেকেই সারা বাংলা দেশের তরুণচিত্তে তিনি যেমন অভূতপর্ব সাড়া জাগিয়েছিলেন, প্রফুল্লচন্দ্রও তেমনি এই অখ্যাত পল্লীটিকে কেন্দ্র করে তাঁর কর্মজীবনের প্রথম পর্ব উদ্‌যাপন করেছিলেন—আরামবাগ ও প্রফুল্লচন্দ্র সেন—একটি পল্লী ও একজন মানুষ—এক ও অভিন্ন হোয়ে বাংলার মানচিত্রে, বাংলার রাজনীতিতে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুদ্ভাসিত। অহিংস অসহযোগের একটা বড়ো রকমের পরীক্ষা সেদিন এখানে হয়ে গিয়েছিল—সে ইতিহাসও সুপরিচিত। আরামবাগ তাঁর কাছে যেন তীর্থক্ষেত্র ; এখানকার জলবায়ু, এখানকার মানুষ, এখানকার পরিবেশ সবই তাঁর এত প্রিয় যে তিনি আরামবাগ ছেড়ে বেশীদিন কোথাও থাকতে পারতেন না। এই যে প্রীতির বন্ধন এই তাঁকে সাধারণ মানুষের এত আপনার করে তুলেছিল যে তিনি যেন মানবিকতার সংযোগ সাধন করে রাজনীতির ক্ষেত্রে এক নতন দিগন্ত উন্মোচিত করে দিয়েছেন।

তাঁর কর্মজীবনের ইতিবৃত্ত আরো একটু বলি। ১৯৩০। লবণ আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হোল মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে। বাংলা দেশেও গঠিত হোল আইন অমান্য পরিষদ। প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন এই পরিষদের চতুর্থ সভাপতি। তার আগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে যে স্বরাজ্যদল গঠিত হয়েছিল এবং যে আন্দোলন চলেছিল, একনিষ্ঠ অসহযোগী প্রফুল্লচন্দ্র তখন ছিলেন নো-চেঞ্জারের দলে। সাময়িক খ্যাতির মোহ তাঁকে আদর্শভ্রষ্ট করতে পারেনি। এই কারণেই তিনি আদর্শ ও সাধনার সঙ্গে সমন্বয় করতে পেরেছিলেন। দেশসেবার পুরস্কার তিনি পরিপূর্ণভাবেই লাভ করেছিলেন—জীবনের এগারোটি বছর তিনি ইংরেজের কারাগারে বাস করেছেন বিভিন্ন সময়ে। যখনই মুক্ত হয়েছেন, তখনই তিনি ফিরে এসেছেন তাঁর কর্মকেন্দ্র হুগলীতে, মিলিত হয়েছেন কর্মীদের সঙ্গে। হুগলীর সঙ্গে আজো তিনি বত্রিশ নাড়ীর টান অনুভব করেন। অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতারূপে, সেটেলমেণ্ট বর্জন আন্দোলনের নায়করূপে প্রফুল্লচন্দ্র যে ইতিহাস সেদিন সৃষ্টি করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করেছে। সে ইতিহাস বাঙালীর সর্বকালের গৌরবের ইতিহাস।

১৯৪৫। এই বছরের শেষভাগে কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করলেন প্রফুল্লচন্দ্র। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তখন আবার নূতন পট পরিবর্তন আসন্ন হয়ে উঠেছে—সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের কবল থেকে ভারতবর্ষ স্বাধীন হোতে তখন আর বেশী বিলম্ব নেই। কেবিনেট মিশনের পর

যে গণপরিষদ গঠিত হয়, প্রফুল্লচন্দ্র তার সদস্য নির্বাচিত হন। ঘটনার স্রোত দ্রুত প্রবাহিত হয়ে চললো। ১৯৪৭-এর মাঝামাঝি বাংলা দেশে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে যে ছায়ামন্ত্রীসভা এবং ১৪ই আগষ্ট পুরোপুরি কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হয়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন ছিলেন তার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। তখন ডাঃ ঘোষের প্রধান মন্ত্রণাদাতাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন অন্যতম।

১৯৪৮। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে গঠিত হোল নূতন মন্ত্রীসভা। অসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী হিসাবে প্রফুল্লচন্দ্র এই মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। সেই থেকে একাদিক্রমে তিনি ডাঃ রায়ের মন্ত্রীসভার প্রধানতম সদস্য ছিলেন। ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর শূণ্যস্থান পূর্ণ করেছেন তিনি। বলা বাহুল্য, সর্বসম্মতিক্রমেই এই পদে বৃত হয়েছেন তিনি। হুগলী জেলার নিভৃত পল্লীতে অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার পর স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রফুল্লচন্দ্রের এই সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হওয়ায় সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে এক স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ পরিলক্ষিত হয়। আজ মনে পড়ে, যেদিন তিনি দলপতি নির্বাচিত হোলেন, তার অব্যবহিত পরে এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রফুল্লচন্দ্র এই মর্মে স্বীয় গভীর প্রত্যয় ঘোষণা করেন: "আমাদের শক্তিশালী নেতা ডাঃ রায়ের নিকট হোতে আমরা যে উত্তরাধিকার লাভ করেছি তা নিঃসন্দেহে আমাদের পথ প্রদর্শন করবে এবং আমাদের চলার পথে আলোক বিকীর্ণ করবে। আমরাও সাহস, নিষ্ঠা ও বিজ্ঞতা সহকারে অগ্রসর হব যার ফলে সমস্যাসঙ্কুল পশ্চিমবঙ্গরাজ্য আমাদের সংঘবদ্ধ শক্তিতে সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে অগ্রসর হয়ে যাবে।" আর মনে পড়ে কলিকাতায় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যখন প্রফুল্লচন্দ্রকে ময়দানে নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জানানো হয় তখন তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন: "বাংলাকে বুঝিতে হইলে যেমন তাহার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝিতে হইবে, তেমনি বুঝিতে হইবে এদেশের মানুষের কথা। আমরা যেমন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আদর্শ মানি, তেমনি আমরা দেশের আধ্যাত্মিকতাকেও অস্বীকার করিতে চাহি না।" তেমনি শ্রীরামপুর সম্বর্দ্ধনার উত্তরে তিনি যে কথা বলেছিলেন তাও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। সেদিন তিনি বলেছিলেন: "দুঃখ-দারিদ্র্য ও সমস্যাসঙ্কুল এই পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি কেবলমাত্র পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রের উদ্যোগে সম্ভব নয়। এজন্য চাই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব। শুধু তাই নয়, আরো প্রয়োজন আধ্যাত্মিক বিপ্লব।" এমন কথা আগে কেউ বলেননি—এইখানেই প্রফুল্লচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য।

অল্পদিনের মধ্যেই দেশবাসী বুঝতে পারল যে যোগ্য পাত্রে যোগ্য দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি সাময়িক পত্রিকার এই মন্তব্যটি আমাদের বিশেষভাবে মনে পড়ে: "স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতা প্রফুল্লচন্দ্র, স্বাধীনোত্তর যুগের খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র আর আজকের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল-চন্দ্রের মধ্যে সেই একই অনন্যকর্মী, উৎসর্গীকৃত জীবন, সেবাব্রতী

কর্মীকেই দেখতে পাই।" (সাধারণী) কিন্তু মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্রের কথা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। আজ আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান সেই প্রফুল্লচন্দ্রের কথা বলব যাঁর দক্ষিণ হস্ত কর্মের পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করেছে বহুবার। তাঁর রাষ্ট্রীক সাধনার আরম্ভক্ষণে তাঁকে আমরা দূর থেকে দেখেছি—আর আজ তিনি পরিপূর্ণ আলোয় প্রকাশিত, দেশবাসীর কাছে আজ তাঁর পরিচয় সুস্পষ্ট।

বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তাঁর জীবন, দেশসেবার বিরাট ক্ষেত্রে প্রফুল্লচন্দ্রের যে পরিণতি আজ আমরা প্রত্যক্ষ করি, তার থেকে তাঁর প্রবল জীবনশক্তির প্রমাণ পাই। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখ, নানা নির্যাতনের মধ্যে। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে অভিভূত করেনি। এই শক্তি (যা প্রথম থেকেই একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়েছে) তাঁর চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তাঁর দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে প্রফুল্লচন্দ্র করে তুলেছেন সুযোগ, বিঘ্নকে সোপান। কোনো পরাভবকেই তিনি একান্ত সত্য বলে মানেননি কোনোদিন। প্রফুল্লচন্দ্রের এই চরিত্র-শক্তি বাংলা দেশের অন্তরের মধ্যে আজ সঞ্চারিত হোক। আর তাঁর নেতৃত্বে সমস্ত ভারতবর্ষের কাছে পশ্চিমবাংলার সম্মিলন যেন সম্পূর্ণ হয়, মূল্যবান হয়, পরিপূর্ণ ফলপ্রসূ হয়—যেন সে রিক্তশক্তি হয়ে পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে। বিদ্বেষহীন মন নিয়ে তিনি সকলকে বলেন, সকলের সেবা করো, সেবার ক্ষেত্রে কি ভেদাভেদ্ থাকতে পারে? অন্ততঃ তাঁর মধ্যে উদার সেবাপরায়ণতার সঙ্গে বলিষ্ঠ রাজনীতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। চিন্তায় ও চরিত্রে, আচারে-আচরণে তিনি এমন একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন যা সকলকেই অতি সহজে আকর্ষণ করে। দেশের দুঃখকে তিনি একদিন আপন দুঃখ বলে গ্রহণ করেছিলেন—আজ দেশের এই সার্থক মুক্তির দিনে বাঙালীর জীবনসাধনা তাঁর সাধনায় সত্য হোক, ওজস্বী হোক, তার আপন বিশিষ্টতা উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। ভাবীকালের ঐতিহাসিক যখন এই কর্মযোগীর জীবনচরিত রচনা করবেন, তখন তিনি দেখতে পাবেন যে, সারল্যে ও সহৃদয়তায়, বীর্যে ও পৌরুষে, স্বদেশপ্রেমে ও মানবিকতায় যে আদর্শ তিনি সৃষ্টি করেছেন, আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে তার একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে। প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সকল চিন্তার ও সকল কর্মের উৎস হচ্ছে আত্মবিলোপ বা আত্মত্যাগের ক্ষমতা। নিজের জয়কীর্তি তিনি নিজেই স্থাপন করেছেন জীবনের উদ্যমশীল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে নয়, সেবা দিয়ে। আজ আর্য-ঋষিদের সেই প্রার্থনাবাক্যটি উচ্চারণ করি:

জিজীবিষেৎ শতংসমাঃ

এই রচনায় বিশিষ্ট জীবনীকার শ্রীমনি বাগচী মহাশয়ের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন

ভাবধারা

শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমার উপদেশবাণী

ও

বর্ত্তমান পরিস্থিতি

আমাদের সকলের পক্ষে পবিত্র শ্রীমার জন্মদিনে আজ আমি শ্রদ্ধানিবেদনের সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। রাজনৈতিক নেতা হিসেবে রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও এই ধরনের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পরিবেশে আমার উপস্থিতি বিস্ময়কর মনে হতে পারে। যা হোক, উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণে আমি যে তৎপরতার সংগে সাড়া দিয়েছি তার কারণ আমি বিশ্বাস করি, আমাদের দেশে রাজনীতি ও রাষ্ট্রতন্ত্রের সংগে আধ্যাত্মিকতা, ধর্মীয় চেতনা অথবা উচ্চ নৈতিক আদর্শগুলি কখনো সম্বন্ধচ্যুত ছিল না। যদি বাস্তব এবং ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজ্যের সমস্যাসমূহের সমাধান আমরা করতে চাই, তা হলে আমাদের সামনে এমন কতকগুলি উন্নত ও উজ্জ্বল আদর্শ রাখতে হবে যার ফলে সমস্ত কাজে আমরা অনুপ্রেরণা ও নির্দেশ পাবো। প্রকৃত আদর্শের উপরই বাস্তবের সত্য প্রতিষ্ঠিত। আমি আজ এখানে পদমর্যাদার গুরুত্ব নিয়ে আসিনি, এসেছি শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার কাছে সত্যজ্ঞানের সন্ধানলাভ করবার জন্য। উপনিষদে যেমন আছে:

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপানিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

আমি এখানে শ্রীমার আশীর্বাদে ধন্য হতেও এসেছি যা আমাদের সকল কাজে নতুন করে শক্তি ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। নবভারতের পুনরুজ্জীবনের এবং সত্য মানব বা দিব্য মানব গড়ে তোলার পরিকল্পনা তাঁদের উপদেশবাণীর মধ্যেই পাওয়া যায়। আমি দার্শনিক

নই, তবে আধুনিক ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে কয়েকটি প্রসঙ্গের অবতারণা করছি।

আপনারা জানেন উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য প্রভাবে ভারতবর্ষে বিরাট সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়েছিল। মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তদানীন্তন বিশিষ্ট ভারতীয়েরা উদ্যোগী হয়েছিলেন, ভারতের ভবিষ্যতকে নূতন পথে ও নূতন সম্ভাবনার মধ্যে চালিত করার জন্য। এই জাতীয় নবজাগরণ বা নবজন্ম না হলে আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আশা একটি দূরায়ত আদর্শই থেকে যেত। নবজাগরণের এই মহান পথিকৃতেরা আমাদের শেখালেন যে, স্বাধীনতায় আছে আমাদের জন্মগত অধিকার, আমরা ভিক্ষুকের জাতি নই, আমাদের মধ্যে নিহিত রয়েছে মানবাত্মার বিরাট সম্ভাবনাসমূহ। আমরা সম্ভবত সর্বপ্রথম জানলাম আমাদের সেই বিরাট সভ্যতার কথা যা অতীতে গ্রীসীয় ও রোমক সভ্যতা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। এই আবিষ্কার জনগণের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে ও এই উদ্দীপনাই সংগ্রামী চেতনায় রূপায়িত হয়ে আমাদের স্বাধীনতালাভে সমর্থ হয়। জনজীবনের রূপায়ণে আদর্শবাদ যে কতখানি সক্রিয় ও সম্ভাবনাময় তা প্রমাণ করবার জন্যেই এই প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম।

আজ স্বাধীনতালাভের পনের বছর পরে আমরা আবার একটি নূতন সংঘাতের সম্মুখীন হয়েছি। শুধু সংঘাত নয়, এ ভারতের আত্মার ওপরে নির্মম আক্রমণ। জাতির এই সঙ্কটমুহূর্তে, আমাদের অতীত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূল্যবান সম্পদগুলিকে যখন ধ্বংস করার উদ্যোগ হচ্ছে, তখন আমাদের উচিত হবে এই দুর্যোগের সম্মুখীন হবার জন্য নির্ভীক ভাবে দাঁড়িয়ে ওঠা, অদম্য শক্তিতে এই আক্রমণের প্রতিরোধ করা। সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য, শিল্পোন্নয়ন ও কারিগরী দক্ষতা নিশ্চয়ই জননী ভারতবর্ষের দেহ ও স্নায়ুকে শক্তিশালী করবে কিন্তু সেইসংগে ভারতমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের উদ্দীপনাময় বাণীরও বিশেষ প্রয়োজন আমাদের মন ও আত্মাকে সুদৃঢ় করবার জন্য। আধ্যাত্মিকতাই চিরদিন ভারতীয় মনের শক্তি ও অনুপ্রেরণার উৎস। এই আধ্যাত্মিকতার আলোতেই আমরা শিখি যে আমাদের দেশ একটা ভৌগলিক বা জাতীয় সমষ্টিমাত্র নয়, এ একটা জাগ্রত সত্ত্বা, আমাদের স্নেহময়ী, প্রাণময়ী জননী। আমার মনে হয় আমাদের মত রাজনৈতিকদের উদ্দেশ্যে এইটিই হোল শ্রীঅরবিন্দের বাণী ও নির্দেশ। কারণ তিনিই একদিন লিখেছিলেন, "স্বদেশ যে ভগবতী জননী, এই উপলব্ধি আমাদের দেশপ্রেমকে সদাজাগ্রত রাখে—যে উপলব্ধি মাতৃদর্শনে সর্বদা মায়ের সেবা ভক্তি ও ধ্যানে আবিষ্ট।"

দুর্ভাগ্যবশতঃ এটা একটা প্রচলিত ধারণা—প্রায় একটা মজ্জাগত সংস্কার দাঁড়িয়ে গেছে যে আধ্যাত্মিকতা একটা পলায়নীবৃত্তির নামান্তর,

এ যেন জীবন থেকে দূরে সরে গিয়ে কোন এক রূপময় আনন্দলোকে উত্তরণ। শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের বাণী যা তাঁরা তাঁদের সাধনার দ্বারা রূপায়িত করেছেন—আমাদের অন্য কথা শোনায়। তাঁরা বলেন যে, প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা জীবনকে অস্বীকার করে না—জীবনকে সার্থক করে ভাগবত পরিপূর্ণতায়। জগতকে ভারতবর্ষ এইটেই দেখাতে চায়, শেখাতে চায়। তাঁরা বলেছেন, জীবনকে দেখতে হবে একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, সত্যকার পদ্ধতি, প্রকৃত শৃঙ্খলা ও উপযুক্ত সংগতির সংগে সবকিছু গ্রহণ করে। শিল্পোন্নয়ন, যান্ত্রিক কুশলতা বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই চূড়ান্ত অভীষ্ট হতে পারে না যদি তার সাহায্যে আমরা আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশের পক্ষে উপযুক্ত অবস্থা ও পরিবেশ গড়ে তুলতে না পারি। আমাদের সর্ববিষয়ে শক্তি অর্জন করতে হবে। প্রতিকূল আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য শারীরিক শক্তিতে বলীয়ান হতে হবে, দেহকে সুদৃঢ় করতে হবে। গ্রাসাচ্ছাদন ও জনসাধারণের মান উন্নয়নের জন্য আমাদের সামর্থলাভ করতে হবে। তবেই আমরা স্বাগত জানাতে পারব সত্য মানবের নব আবির্ভাবকে—মানবতার নব চেতনাকে। আমার বন্ধুদের কাছে শুনেছি যে শ্রীমা, যিনি বহুদিন ভারতবর্ষকে তাঁর দেশজননী বলে গ্রহণ করেছেন, তিনি নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা ও অসীম সংগঠনী শক্তি দিয়ে পণ্ডিচেরী আশ্রমের ক্ষুদ্র পরিধিতে এই ভাবী দিব্যসমাজের রূপায়ণে নিবিষ্ট আছেন।

তাঁর জন্মোৎসব সত্যকার প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে যদি আমরা সকলে তাঁর সেই আদর্শ সমবেতভাবে গ্রহণ করি। তবেই আমরা অতীতের সঞ্চিত তপস্যার ফলভোগ করবো, বর্তমানের অনবদ্য সাধনায় অংশ নেব ও ভাবীকালের বিরাট সম্ভাবনায় আশাবাদী হয়ে উঠতে পারব।

মহাজাতি সদনে একুশে ফেব্রুয়ারী শ্রীমার জন্মদিন উৎসবে উদ্বোধনী ভাষণের অনুবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা ও তাহার সমাধান

আজ এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমার দেশবাসী যে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, গুরুজনেরা আশীর্বাদ ও ছোটরা প্রণাম জানাইলেন আমি তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলাম।

আমার উপর যে গুরুদায়িত্ব বর্তাইয়াছে আমি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, এ দায়িত্ব শুধু আমার একার নহে, এ দায়িত্ব সমস্ত দেশবাসীর। যাঁহারা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করেন—গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নিজেদের কর্তব্য তাহারা উপলব্ধি করিবেন, মন্ত্রীমণ্ডলীও তাঁহাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হইবেন।

বাঙলার সমস্যার যে জটিলতা, যে ব্যাপকতা তাহা যদি উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, তবে পথ সহজ হইবে। জানি যদিও এ পথে অনেক দুরূহ বাধা রহিয়াছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, সেই দুরূহ পথ আমরা অতিক্রম করিয়া আদর্শকে উপলব্ধি করিতে পারিব—সমাধান করিতে পারিব বাঙলা ও বাঙালীর শত সহস্র সমস্যার।

বাঙলাকে বুঝিতে হইলে যেমন তাহার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে বুঝিতে হইবে, তেমনি বুঝিতে হইবে এদেশের মানুষের কথা—মনে রাখিতে হইবে বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি। এ নিশ্চিত আমরা যেমন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আদর্শকে জানি, বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হইয়া বাঙলাকে সমৃদ্ধ করিতে চাহি, তেমনি আমরা এই দেশের আধ্যাত্মিকতাকেও অস্বীকার করিতে চাহি না। আমরা চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ মহামানবদের কথা কোনদিন বিস্মৃত হইব না।

কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত ভারত আসিয়া মিলিত হইয়াছে। দেশ বিদেশের সকল ধর্মের লোক এখানে আছে। আমাদের সকলের কথাই সমানভাবে চিন্তা করিতে হইবে। সকল পরিস্থিতির সম্যক উপলব্ধি করিয়া আমাদের কাজ করিতে হইবে।

১৫ বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা ছিল ২ কোটি ২৬ লক্ষ। এখন এই সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে সাড়ে তিন কোটি। পশ্চিমবঙ্গের আয়তন মাত্র ৩৫ হাজার বর্গমাইল। প্রতি বর্গমাইলে লোক বাস করে ১ হাজার। সেইজন্য জমির উপর অভূতপূর্ব চাপ পড়িয়াছে। আমরা মোট চাষযোগ্য জমির শতকরা ৮৭ ভাগ জমিতেই চাষ করি। পৃথিবীর আর কোন দেশে জমিতে এত ঘনভাবে চাষ করা হয় না। আমাদের দেশের নদনদীর অবস্থা শোচনীয় সেজন্য সমস্যা আরও সংগীন হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের বেকার সমস্যা এক ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বাঙলা দেশে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বৃহৎ শিল্পে অনেক উন্নতি হইয়াছে কিন্তু ছোট ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের মধ্য দিয়াই আমরা কর্মসংস্থান ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে প্রয়াসী হইতেছি।

দেশ বিভাগের পর ৩৫ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন। ইঁহাদের পুনর্বাসনের সমস্যা এক বিরাট সমস্যা। সেই সমস্যার কথা চিন্তা করিলে মনে হয় সমাধান করিতে পারিব না। কিন্তু যেখানে ইচ্ছা-শক্তি বলবতী ও ধর্মবৈষম্য দূর করিয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নির্দিষ্ট আদর্শ রহিয়াছে, সেখানে ভয়াবহ বলিয়া কিছু নাই। সাহসিকতার সঙ্গে আমাদের সকল সমস্যা সমাধানের সঙ্কল্প লইয়া আগাইয়া আসিতে হইবে।

এক সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে কলিকাতা মহানগরীর কথা ভাবিতে হইবে। কলিকাতা মহানগরীর সমস্যা বহুবিধ, এই শহরে ৩০ লক্ষ লোকের বাস। প্রতি বর্গমাইলে ৮০ হাজার লোক এখানে মাথা গুঁজিয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর অপর কোন শহরে এমন চাপ নাই। নিউইয়র্ক, টোকিও প্রভৃতি শহরে প্রতি বর্গমাইলে ৬৫ হাজার করিয়া লোক বাস করে।

কলিকাতার রাস্তাঘাট অপ্রতুল, যানবাহনের সমস্যা দুর্বিসহ। এ শহরকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। কলিকাতা বন্দরের অবস্থা শোচনীয়। এই বন্দরের উন্নতির জন্য সরকার গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। শীঘ্রই এই ব্যারেজের নির্মাণকার্য্য শুরু হইবে। এই ব্যারেজ নির্মাণ সম্পন্নে প্রায় ৭।৮ বৎসর লাগিবে। কলিকাতা—হাওড়া পারাপারের জন্য অন্ততঃ আরও একটি সেতু দরকার। এজন্যও প্রয়োজন ৯ কোটি টাকা। কলিকাতার পয়ঃপ্রণালী ও বস্তীগুলির অবস্থাও শোচনীয়—চিন্তা করিলে মাথা হেঁট হইয়া আসে। কলিকাতায় বাঙলার সমস্ত জেলার অধিবাসীই বাস করে। এই নগরী রাজ্যের রাজধানী। সুতরাং কলিকাতার উন্নতির জন্য সকলের সমান দায়িত্ব রহিয়াছে।

কলিকাতায় বহুসংখ্যক গুণ্ডা ও সমাজবিরোধী ব্যক্তি রহিয়াছে। ইহা সত্য যে মহানগরীর শান্তি রক্ষা করা অসম্ভব, যদি না গুণ্ডা দমন হয়। গুণ্ডা দমনে সক্রিয় সহযোগিতা পাইলে আমরা নিশ্চয় কলিকাতা হইতে গুণ্ডা ও অসামাজিক শ্রেণীর লোককে উৎখাত করিতে পারিব। পুলিশবাহিনী প্রাণ দিয়া ইহাদের দমন করিতে চাহে।

ছাত্র-ছাত্রীরা দেশের ভবিষ্যৎ। তাহাদের মুখপানে চাহিয়াই আমরা সকল কাজ করিতেছি। আমাদের সাহসও আছে, ভরসাও আছে। আমাদের সমস্ত কাজই ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য করা হয়। আমরা আশা করি দেশের যুব ও ছাত্রসমাজ এমনভাবে নিজেদের তৈয়ারী করিবেন যাহাতে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়। যদি আমরা কলিকাতায় শান্তি শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি তবে অন্যান্য জেলা সমূহ সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে এবং এক নূতন বাংলা সৃষ্টি হইবে।

প্রাণের বিনিময়ে কলিকাতার শান্তি শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখিব আজ যদি সকলে এই সঙ্কল্প, প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে পারি তবেই এই আনন্দ-অনুষ্ঠানের আয়োজন সার্থক হইবে।

আমি পূর্বেও বলিয়াছি এখনও, বলিতেছি কমিউনিজম্ আমাদের কোন সমস্যাই নহে। বিগত ১৫ই আগষ্ট যখন আমরা ২৫জন দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি প্রদান করি তখন অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ইহাতে দেশ ও সমাজে শান্তি বিঘ্নিত হইবে। অনেকে বলিয়াছিলেন গণচাপেই আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। গণতান্ত্রিক দেশে গণচাপ পাঁচ বৎসরে একবার করিয়া আসে। নির্বাচনই গণচাপ। আমাদের মালিক, আমাদের রাজা, দেশের আপামর জনসাধারণ। জনতার হুকুমেই, জনতার নির্দেশেই, সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছে। কোন গণচাপে ঐ রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দেওয়া হয় নাই, এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী আনার জন্য তাহাদের মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

যতদিন আমাদের পথপ্রদর্শক ও নেতা ছিলেন মহান নেতা ডাঃ রায়, আমরা মনে করিতাম আমরা একটা বটবৃক্ষের ছায়ায় রহিয়াছি, মনে করিতাম আমরা বিশ্রাম করিতে পারি। ডাঃ রায়ের মহাপ্রয়াণের পর রাজ্য মন্ত্রীসভার সকল সদস্য ১৪।১৫ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতেছেন। আমরা স্বর্গীয় মহান নেতা কর্মযোগী ডাঃ রায়ের নিকট হইতে কর্মনিষ্ঠা, কর্তব্যবোধ শিক্ষা করিয়াছি। কাজ করিতে করিতে যদি প্রাণ বিসর্জন দিই, তাহাতেও ক্ষতি নাই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকল ভাইবোনে কাজ করিবেন, কর্মী হইবেন, বাঙলা দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবেন ইহাই কাম্য। যদি কর্মবিমুখতা দূর, করিয়া ভগবানে অটল বিশ্বাস রাখিয়া আমরা ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে অগ্রণী হই তবে নিশ্চয় দেশের সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারিব।

মহান নেতা ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস দলাদলি ভুলিয়া গিয়া ভারতবর্ষকে দেখাইয়া দিয়াছে একতা কাহাকে বলে। দেখাইয়া দিয়াছে, বৃহত্তর প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মান অভিমান ভুলিয়া গিয়া পশ্চিমবঙ্গ সংহত, ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে।

আজ সকলের অবশ্য কর্তব্য গণতন্ত্রের আদর্শ সম্যক উপলব্ধি করা। দেশকে বড় করিতে হইলে, জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিতে হইলে দেশে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ছাত্র সমাজকেও সর্বাগ্রে রাজনীতি নহে, গণতন্ত্র উপলব্ধি করিতে হইবে। দেশে অন্যায় প্রতিরোধ করিতে পারিলে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। মানুষ যতদিন না ভাল হইবে ততদিন কোন সমাজ ব্যবস্থা স্থায়ী ও সুন্দর হইবে না। আজ আমরা ভগবানের নাম করিয়া এই দীক্ষা লইব যে কলিকাতায় সকল অসামাজিক কাজেই আমরা সক্রিয় ভাবে প্রতিরোধ করিব। একজন কংগ্রেস কর্মীরূপে, জনগণের সেবকরূপে এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে কংগ্রেস দেশের সকল দুঃখ দুর্দশা দূর করিবে, সকল বিপদের সহিত সংগ্রাম করিবে। কেবল চাই এই সকল কাজে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা।

আমাদের সমস্যা সহজ নহে, কঠিন, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা কেহ ভীত নহি। এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আমি সকলের যে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ পাইয়াছি সেজন্য আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২ কলিকাতা ময়দানে অনুষ্ঠিত নাগরিক সম্বর্দ্ধনায় এই ভাষণটি প্রদত্ত হইয়াছিল।

সর্ব্বাত্মক বিপ্লবের প্রস্তুতিতে বাংলার ভূমিকা

রাজা রামমোহন, রামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, ডাঃ আশুতোষ দাস ও আরও বহু মহামানবের পদধূলি যে জেলায় পড়িয়াছে সেই হুগলী জেলায় আপনারা আমায় সম্বর্ধনা জানাইলেন। ইহার গুরুত্ব অসীম। মালায় মালায় আমি যে কেবল ভারাক্রান্ত ও অভিভূত হইয়াছি তাহা নয়, ইহা আমার উপর যে গুরু দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে তাহাও গভীর শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি। আমি যেন ইহার যোগ্য হইয়া আপনাদের সেবা করিতে পারি।

দীর্ঘ একচল্লিশ বৎসর পূর্বে দুয়াদণ্ড, বড়ডোঙ্গল ও আরামবাগের ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত গ্রামগুলিতে যে মহান ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য আমি পদযাত্রা শুরু করিয়াছিলাম সেই দিন ভাবি নাই যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগের বৈষম্য ও রাজশক্তির পীড়নে নির্য্যাতিত দেশবাসীর উন্নতির দায়িত্ব এত শীঘ্র আমাদের উপর বর্তাইবে। স্বাধীনতার পর দেশবাসীর সকল দুর্দশা দূর করিতে পারি নাই ইহা সত্য, তবে কয়েকটি পরিকল্পনা সফল করায় তাহাদের বেশ কিছুটা উন্নতি সাধন হইয়াছে তাহা নিশ্চিত।

দুঃখ, দারিদ্র্য ও সমস্যাসঙ্কুল এই রাজ্যের উন্নতি কেবলমাত্র পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রের উদ্যোগে সম্ভব নহে। আজ দেশে চাই বিপ্লব, চাই এক মহান সামাজিক বিপ্লব।

সম্প্রতি বিনোবাজীর সহিত আমার যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে বিনোবাজীও মনে করেন যে, বাংলা দেশই এই ধরনের বিপ্লবের উপযুক্ত ক্ষেত্র। রামকৃষ্ণের শ্রীঅরবিন্দের বাংলা দেশে নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক বিপ্লব চাহিব। এই পুণ্য ভূমিতেই সেই বিপ্লব ঘটিবে।

আপনারা যখন আমাকে মালা দিতেছিলেন তখন ভাবিতেছিলাম আমি আপনাদের কি দিতে পারি? আপনারা কিন্তু আমায় অনেক কিছু

দিতে পারেন। আপনারা আমায় শক্তি, সহযোগিতা, বন্ধুত্ব ও সমর্থন দিন।

নূতন আধ্যাত্মিকতার জন্মভূমি হুগলী জেলায় আমরা সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়া যেন সর্ব্বাত্মক বিপ্লব আনিবার অভিযান শুরু করি। আমাদের অনেক দোষও যেমন আছে, আমাদের তেমন অনেক গুণও আছে। সেই গুণ গুলিকে একত্রিত করিতে আপনাদের শক্তি ও সহযোগিতা পাইলে ভারতে নিশ্চয় নূতন বিপ্লবের সূচনা হইবে।

কোন সরকারই নিছক স্বকীয় চেষ্টায় প্রার্থিত বিপ্লব সাধনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে না। আমি গভীর আশা পোষণ করি যে, জনগণ সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সুনিশ্চিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিবেন। আমি পশ্চিমবাংলায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লবসাধনে সক্রিয়, সহযোগিতার জন্য আহ্বান জানাই।

হুগলী জেলা প্রফুল্লচন্দ্র সম্বর্দ্ধনা সমিতির উদ্যোগে ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬২ শ্রীরামপুরে অনুষ্ঠিত সভায় যে ভাষণটি প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার সারাংশ।

দেশরক্ষায় জনসাধারণের কর্তব্য

ভাইফোঁটা উপলক্ষে আমি বাংলার বোনেদের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলাম, ভারতের সীমান্তরক্ষী বীর জোয়ানদের কথা স্মরণ করে, তাঁদের মঙ্গলের জন্য, তাঁদের দেশরক্ষার মহান ব্রতে সহায়তা করার জন্য, সোনা দিয়ে, গয়না দিয়ে, টাকা দিয়ে দেশরক্ষা ভাণ্ডার পূর্ণ করে দিতে। গত প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে আমরা সকলেই গর্ব অনুভব করতে পারি। আমরা এই ক'দিনে প্রায় দুই হাজার তোলা সোনা এবং গয়না পেয়েছি, আর টাকা পেয়েছি তেইশ লক্ষ।

দেশরক্ষা ভাণ্ডারকে আমাদের বিরাট করে গড়ে তুলতে হবে। আমি আশা করি বাংলার প্রতিটি নরনারী অকুণ্ঠচিত্তে নিজ নিজ সাধ্যমত এই তহবিল পূর্ণ করার কাজে সক্রিয় সহায়তা করতে থাকবেন। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর বিবাদ শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা হোক এটাই আমরা চাই। কিন্তু জাতির সার্বভৌমত্ব ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করে বিশ্বাসঘাতক আক্রমণকারী শত্রুকে প্রত্যাঘাত করার জন্যও আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। সুতরাং একদিকে আমাদের যেমন গড়ে তুলতে হবে আক্রমণকারীকে আঘাত করার শক্তি, আধুনিক অস্ত্র নির্মাণ করে এবং সংগ্রহ করে, অপরদিকে আমাদের গড়ে তুলতে হবে জাতীয় চরিত্র ; যে চরিত্র অম্লানমুখে জাতির কল্যাণের জন্য দুঃখ বরণ করতে প্রস্তুত, যে নির্ভীক মনোবল সমস্ত বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করে এগিয়ে যাবে দেশরক্ষার কাজে। আমাদের প্রত্যেককে বুঝতে হবে যে, ভারতের সুদূরতম অঞ্চলের অধিবাসী প্রতিটি নরনারীর সঙ্গে আমাদের নাড়ীর সম্পর্ক। চীনের সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের প্রত্যুত্তরে আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে শৌর্য ও গভীর দেশপ্রেম। জাতির এই অগ্নি পরীক্ষায় আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, আমাদের প্রতিটি কাজের ফল আমাদের দেশের ভবিষ্যত গড়ে তুলছে ; প্রতিটি মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। এ সম্বন্ধে আমি আমার দেশবাসীকে দু একটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে অনুরোধ করি।

ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনে যে খরচ না করলে চলে সে খরচ আমরা করব না। যে পণ্য না কিনলেও চলতে পারে সে পণ্য টাকা থাকলেও কিনবো না। সকলেই সাধ্যমত ব্যয় সঙ্কোচ করে যে সঞ্চয় সম্ভব হবে তাই দিয়ে ভারত সরকার থেকে দেশরক্ষা বণ্ড, দেশরক্ষা সার্টিফিকেট, নতুন প্রাইজ বণ্ড ইত্যাদি কিনে দেশরক্ষা তহবিল গড়ে তুলতে সহায়তা করবো আমরা সকলে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমরা যে হারে উৎপাদন বাড়িয়েছি, অথবা তৃতীয় পরিকল্পনায় যে হারে উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্য স্থির করে আমরা এগিয়ে চলেছি, চীন কর্তৃক ভারত সীমান্ত বর্ব্বরোচিত নগ্নভাবে আক্রমণ করার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন আরও বেশি বাড়াতে হবে। আমাদের কৃষক ভাইদের আজ মনে রাখতে হবে যে, যে ফসল তিনি উৎপাদন করবেন সে ফসল দিয়ে তার একার নয় আরও অন্তত পাঁচটি পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষক ভাইরা যাতে আরও বেশি ফসল ফলাতে পারেন তারজন্য সরকার থেকে সেচের জল, ভালো বীজ, রাসায়নিক এবং জৈব সার এবং সর্ব্বোপরি উন্নত প্রণালীতে চাষের শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত আরও প্রসারিত করা হচ্ছে। কিন্তু চাষী ভাইদেরও নতুন উদ্যমে এগিয়ে আসতে হবে। দেশে আরও বেশি খাদ্য আর বিভিন্ন কাঁচামাল উৎপাদন করতে হবে, যা দিয়ে আমরা নির্মাণ করতে পারবো সীমান্তরক্ষী বীর জোয়ানদের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম।

কল-কারখানায় যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের প্রতিও আমাদের একই আবেদন। স্বাধীনতা লাভ করার কিছুদিন পরে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী জওহরলাল নেহেরু দেশবাসীর প্রতি এক আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'আরাম হারাম হ্যায়', এই বাণীকে আজ আমাদের সার্থক করে তুলতে হবে। শ্রমিক মালিক বিরোধ ভুলে গিয়ে এখন সমবেত ভাবে চেষ্টা করতে হবে শিল্পের সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াতে। সমরোপকরণের উৎপাদন ছাড়াও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রও আমাদের বেশি করে উৎপাদন করতে হবে।

একদিকে যেমন উৎপাদন বাড়াতে হবে অপরদিকে তেমনি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, উৎপাদনের ব্যয় না বাড়ে এবং নিত্য ব্যবহার্য জিনিষপত্রের দাম সাধারণ লোকের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে না যায়। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিজেরাই উদ্যোগী হ'য়ে সচেষ্ট হবেন আশা করি। সদিচ্ছা এবং দেশপ্রেম থাকলে ক্রেতা সাধারণ এবং ব্যবসায়ীদের সমবেত প্রচেষ্টায় মূল্যমাণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে। উৎপাদক, পাইকারী এবং খুচরা ব্যবসায়ী এবং ক্রেতা সাধারণ যদি বর্তমান জাতীয় সঙ্কটের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সরকারের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করেন তাহ'লে

আমি আশা করি জিনিষপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন সরকারী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগের আবশ্যক হবে না।

আর একটি বিষয়ে আমি আপনাদের সকলকে লক্ষ্য রাখতে আহ্বান জানাবো। একদিকে যেমন উৎপাদন বাড়াতে হবে অপরদিকে তেমনি আমাদের দেখতে হবে, যে জাতীয় সম্পদের কোনপ্রকার অপচয় না হয়। আমাদের গণতান্ত্রিক দেশ—সরকার জনগণেরও সুতরাং সরকারী সম্পদ জনগণের সম্পদ। দেশের যানবাহন, রাস্তাঘাট সবকিছুই যাতে সযত্নে রক্ষিত হয় তারজন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। একদিকে যেমন খরচের বেলায় মিতব্যয়ী হতে হবে, দ্রব্যের বেলাও আমাদের মিতাচারীতার পরিচয় দিতে হবে। এমনি করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজ নিজ সাধ্যমত আমরা জাতির শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারি।

সম্প্রতি জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের অধিবেশন সমাপ্ত হয়েছে। এই অধিবেশনে স্থির করা হয়েছে যে, বর্তমান সঙ্কটেও আমরা স্বাধীন ভারতের মূলনীতি দু'টি থেকে বিচ্যুত হবো না। যে গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রাকে অবলম্বন করে ভারতবর্ষ গত চোদ্দ বছর যাবত নিজস্ব দৃঢ়তার সঙ্গে উন্নতির পথে এগিয়ে চলছে সেই গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রাকে সর্বস্ব পণ করেও আমাদের রক্ষা করতে হবে। দ্বিতীয়ত পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের কাজকেও আমরা কোনপ্রকারে ব্যাহত হতে দেবো না।

জয় হিন্দ

কলিকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে ১৯৬২ সালের ৯ই নভেম্বর প্রচারিত।

আগামীকালের নাগরিক

আজ আমাদের চোখের সামনে যারা বড় হচ্ছে কাল তারাই নেবে দেশের ও সমাজের ভার। তারাই আইন তৈরী করবে, তারাই শাসন করবে দেশ, তাদেরই উপর নির্ভর করবে জনগণের কল্যাণ ও উন্নতি। আগামীকালের নাগরিক আজ গড়ে উঠছে গ্রামে, সহরে, স্কুলে, কলেজে, লাইব্রেরীতে। এসব জায়গাতেই চলছে আগামীকালের দায়িত্ব নেবার প্রস্তুতি।

নাগরিক কথাটার সংজ্ঞা যুগে যুগে বদলাচ্ছে। একসময় রাষ্ট্র ছিল নগরেরই নামান্তর। নগর থেকে নাগরিক শব্দের উৎপত্তি। তখন নগরের মুষ্টিমেয় লোকের নাগরিক অধিকার ছিল। আর তারাই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করত। সে সময় যানবাহনের বা রাস্তাঘাটের এত সুবিধা ছিল না। তাই মানুষের সমাজ জীবন বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠেছিল। সেদিনকার নাগরিকের ছিল ছোট গণ্ডী। এই ছোট নগর-রাষ্ট্রের বাইরে তারা চিন্তা করতে পারত না।

ক্রমে সমাজের পরিধি বেড়েছে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে রাষ্ট্রের পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়েছে। আজকের নাগরিক জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্রের নাগরিক। অনেক সহর অনেক গ্রাম নিয়ে সেই জাতি ছড়িয়ে আছে। আজকের নাগরিক সহরে থাকে কি গ্রামে থাকে তা দিয়ে তার পরিচয় নয়। তার পরিচয় তার নাগরিক অধিকার দিয়ে। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করবার অধিকার দিয়ে আজ নাগরিকের সংজ্ঞা নিরূপণ হয়।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর পরিধি অনেক ছোট হয়ে এসেছে। আজ যখন মানুষ চাঁদে বা অন্য গ্রহে যাবার কল্পনা করছে, তখন এ ভাবনাও তার মনে আসছে যে কালকের নাগরিক শুধু ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্রের নাগরিক বলেই নিজের পরিচয় দেবে না, হয়ত পৃথিবীর নাগরিক হয়ে চাঁদের নাগরিকের সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

চাঁদে যাওয়া সম্ভব হোক্ বা না হোক্, একথা সত্যি যে আগামী কালের নাগরিককে আজকের চেয়েও বেশী করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কথা চিন্তা করে চলতে হবে। দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে আদানপ্রদান এত বেড়ে গিয়েছে যে পৃথিবীর এক কোণে কোন আলোড়ন হলে তার ঢেউ আর এক কোণে এসে আঘাত করে। আগামীকালের নাগরিককে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আগামীকালের জন্য প্রস্তুত হতে হবে তা সর্বদিকদর্শী হওয়া দরকার। কূপমণ্ডুকের স্থান জগতে আজ আর নেই।

কালকের নাগরিকের নাগরিক চিন্তা সারা পৃথিবীকে নিয়ে হলেও তার নিজের রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য তাকে রাখতেই হবে। ভৌগোলিক সীমা-ভিত্তিক বা জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্র যে অচিরেই লুপ্ত হয়ে যাবে এমন কথা চিন্তা করবার কারণ এখনও ঘটেনি। বরং ইতিহাসের যে ধারা বহন করে আজকের রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠিত হয়েছে তাকে সুসংহত করবার প্রয়াস, অন্যান্য রাষ্ট্রের নাগরিকের সঙ্গে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তার সমৃদ্ধির প্রয়াস আগামীকালের নাগরিকের মধ্যে আরো বেশী করে প্রকাশ পাবে।

পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের দেশেও এসেছে এক বিরাট আলোড়ন। যে মহাযজ্ঞ আজ এদেশে আরম্ভ হয়েছে সে যজ্ঞের সুফল ভোগ করবে আগামীকালের নাগরিক। আর সুফল ভোগ করবে বলেই তাকে নিজেকে তৈরী করতে হবে নতুন দেশকে আরো উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। আমাদের দেশে চলছে গণতন্ত্রের জয়যাত্রা। এদেশের আজকের নাগরিক রাষ্ট্রীয় ও সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। এই চেতনা কালের নাগরিকের মধ্যে আরো পরিপূর্ণভাবে দেখা দিলে রাষ্ট্রের কল্যাণ পুরোপুরিভাবে সাধিত হবে। আমাদের পূর্বসুরীরা যে বনিয়াদ গেঁথেছেন তার ওপরে যে গঠন কাজ চলছে কালকের নাগরিককে তাকে আগে বাড়াতে হবে। দেশকে চিনতে হবে, জাতিকে সমাজকে জানতে হবে; তার ইতিহাস, তার আদর্শকে মনপ্রাণ দিয়ে অনুধাবন করতে হবে। আর তার সঙ্গে বিজ্ঞানের দানগুলিকে আয়ত্ব করে তার সাহায্যে জনকল্যাণের পথ আরও প্রশস্ত করে তুলতে হবে। আমাদের দেশে আজ যে নাগরিক জন্মগ্রহণ করছে সে কতকগুলি মৌলিক অধিকার নিয়ে জন্মাচ্ছে। সে অধিকার প্রথমতঃ তার জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ হয়ে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে বেঁচে থাকার অধিকার—শিক্ষা ও স্বাধীন চিন্তার অধিকারী হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার। জীবিকার্জনের ব্যাপারে সব নাগরিকের সঙ্গেই তার সমান অধিকার। ধর্ম সম্বন্ধে মতামত পোষণ করবার ব্যাপারেও তার প্রভূত অধিকার। নতুন অধিকারের বলে ভারতের যে কোন অংশে সে বাস করতে পারে। জীবনধারণের জন্য যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে। যে কোন ব্যবসায়েও লিপ্ত হতে পারে। এককথায় আমাদের দেশের শিশু যে

অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীর অনেক সভ্যদেশের শিশুই তা করে না।

এই অধিকার নিয়ে যে জন্মগ্রহণ করল এক সুশৃংখল সমাজ গঠনের দায়িত্ব নেবার জন্য তাকে প্রস্তুত হতেই হবে। কালকের নাগরিক যাতে স্বাস্থ্যে, শিক্ষায়, চরিত্রবলে দেশের গৌরবস্থল হতে পারে তারজন্য এদেশের প্রত্যেক যোজনায় উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শিক্ষার সুযোগ যাতে অধিকাংশ লোক পায় তারজন্য গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে আর বেড়ে চলেছে শিক্ষকদের শিক্ষণের ব্যবস্থা। কারিগরী শিক্ষার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং পলিটেকনিক্ কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আরো কয়েকটি হবে। দেশে গড়ে উঠছে নতুন শিল্প, চাষবাসের উন্নত প্রণালীতে খাদ্যের সংস্থান হচ্ছে আরও বেশী। স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্য যে প্রকল্পগুলি অবলম্বন করা হচ্ছে তার সুফল এরই মধ্যে দেখা যাচ্ছে। দেশে রোগের আক্রমণের আর মৃত্যুর হার অনেক কমে গেছে। লোকের আয়ুও বেড়েছে। আগামীকালের নাগরিক যাতে সুগঠিত দেহ মন নিয়ে গড়ে উঠতে পারে তারজন্য বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে। সামরিক শৃংখলা ও আত্মরক্ষা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর ইত্যাদির মাধ্যমে।

চারদিকে আজ যে উন্নয়নের প্রয়াস চলেছে তাতে কালকের নাগরিক যে অনেক উন্নত পরিবেশে জীবনযাপন করবে এবং তার জীবনযাত্রার মান যে আরো উন্নত হবে একথা বলাই বাহুল্য। এই উন্নয়নের প্রসঙ্গে একটি কথা কালকের নাগরিককে বিশেষ করে মনে করিয়ে দিতে হবে—জাতীয় সংহতির কথা। এক বিশাল ভারতবর্ষের লোক আমরা। নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের মধ্যে এদেশ গড়ে উঠছে। বিদেশী শাসনের সময় আমাদের যেভাবে এক করা হয়েছিল তা থেকে আমরা ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক একতার চেয়ে খুব বেশী কিছু পাইনি। স্বাধীনতা অর্জন করবার প্রচেষ্টায় আমাদের মধ্যে যে ঐক্যের সৃষ্টি হয়েছিল দেশগঠনের সময় আজ তাকে সুসংহত করবার প্রয়োজন এসেছে। আগামীদিনের ভারতীয় নাগরিক তার আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক মনোবৃত্তির অনেক উঁচুতে উঠে একে অন্যকে কাছে টেনে নিয়ে নতুন ভারতের প্রতিষ্ঠা করবে। নিজেদের বৈশিষ্ট্যকে যতদূর সম্ভব বজায় রেখে এক সর্বভারতীয় মনোবৃত্তি গড়ে উঠুক আজ আগামী-দিনের নাগরিকের মধ্যে। আজ দেশ যখন বহিঃশত্রুর আক্রমণে এক গভীর সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে তখন এক হয়ে আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দাঁড়াতে হবে। ভাবীকালের নাগরিকও আজকের এই একতার মধ্য দিয়ে যে প্রেরণা পাবে তাতে ভারতের অখণ্ড জাতীয়তার ভিত্তি দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হবে। এই আমার বিশ্বাস ও আশা।

একুশ

আজ আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর জন্মদিবস। এই শুভদিনে আমি তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করি। প্রার্থনা করি, তিনি আরও বহুদিন আমাদের নেতৃত্ব করুন।

কলিকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে ১৯৬২ সালের ১৩ই নভেম্বর প্রচারিত।

আক্রমণের বিরুদ্ধে সামগ্রিক জনউদ্যোগ

বন্ধুগণ, আমাদের পবিত্র মাতৃভূমির উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে কমিউনিস্ট চীনের অন্যায় ও নগ্ন আক্রমণের কথা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। এই আক্রমণের ফলে সমগ্র ভারতে যে গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে সে সম্বন্ধে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী জওহরলাল নেহরু,এবং অন্যান্য নেতৃবর্গ বেতার ও জনসভার মাধ্যমে আপনাদিগকে অবহিত করিয়াছেন। এই সঙ্কটে জাতির সমগ্র শক্তি যাহাতে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার কাজে নিয়োগ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সমগ্র ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন।

শান্তিপ্রিয় ভারতবাসী জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বিগত প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের শিক্ষালাভ করিয়াছে। কমিউনিস্ট চীনের সহিত আমাদের সুদীর্ঘ সীমান্ত সমস্যা আমরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ন্যায়নীতিবিবর্জিত, অস্ত্রবলে দর্পিত চীন সরকার আমাদের শান্তিপ্রিয়তাকে দুর্বলতা মনে করিয়াছে। আমাদের শান্তিপূর্ণ আলোচনার জবাব দিয়াছে নগ্নতম বর্ব্বর আক্রমণের দ্বারা। আমাদের সার্বভৌম স্বাধীনতার প্রতি চীন যে নির্মম আঘাত হানিয়াছে, তাহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য আমাদিগকে সুদৃঢ়ভাবে সংহত হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী বেতারভাষণে জাতির প্রতি যে নির্দেশ দিয়াছেন, তাহা আমি আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, যতদিন না আমরা জয়লাভ করিব, ততদিন আমরা কিছুতেই নতি স্বীকার করিব না।

চীনের আসুরিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য চাই দৃঢ়

আত্মবিশ্বাস, গভীর দেশপ্রেম এবং সমবেত ও সামগ্রিক প্রচেষ্টা—একই মন্ত্রে—দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব পণ। ভারতের কৃষক, শিল্পশ্রমিক, বুদ্ধিজীবী—সকলকেই এক নূতন উদ্যমে ও প্রেরণায় একদিকে যেমন উৎপাদন বাড়াইবার জন্য সকলপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে, অপরদিকে তেমনি ব্যক্তিগতভাবে ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার সম্ভবমত কমাইয়া জাতীয় সম্পদের সর্ববৃহৎ অংশ যাহাতে স্বাধীনতা রক্ষায় এবং অন্যান্য উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ব্যয়িত হইতে পারে, তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

আধুনিক সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ উপাদান যে সমস্ত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র তাহা উপযুক্ত পরিমাণে আমাদের দেশে উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। শান্তিপ্রিয় জাতি হিসাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম এবং অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের দিকে যদিও সম্যক দৃষ্টি দিতে পারি নাই তথাপি জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রকেও শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত ও সংগ্রহকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। সমরোপকরণের জন্য একটি জাতীয় দেশরক্ষা তহবিল গঠন করা হইয়াছে। আমি জাতিবর্ণ নির্বিশেষে পশ্চিমবাংলার প্রতিটি নরনারীকে এই তহবিলে স্বর্ণ অথবা অলঙ্কার দান করিয়া ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিজ নিজ সাধ্যমত অংশগ্রহণ করিতে আহ্বান করিতেছি।

প্রতিটি নরনারীর পক্ষে সীমান্তে যাইয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যোগদান করা সম্ভব নয়। কিন্তু স্বাধীন ভারতের জওয়ানগণ সমরক্ষেত্রে যাহাতে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিয়া শত্রুর হঠকারিতার উপযুক্ত জবাব দিতে সমর্থ হয় তাহার জন্য বীর জওয়ানদিগকে প্রচুর পরিমাণ আধুনিক সামরিক সাজসরঞ্জাম যোগান দিতে হইবে। এই সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য যে বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন, স্বর্ণ হইতেই তাহা সহজলভ্য।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত পরিবার আজ ভাইফোঁটা উপলক্ষে উৎসবমুখর। বাংলার বোনেরা এইদিনে বাংলার ভাইদের ঘরে ঘরে মঙ্গলাচরণ করেন—শতায়ু কামনা করেন।

পশ্চিমবাংলার প্রতিটি ভগ্নীকে আজ আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, গৃহে যেমন তাঁহার ভাইদের দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছেন, ভারতের সীমান্তে স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত প্রতিটি জওয়ানও তেমনি ভাই-এর মত তাঁহার আশীর্বাদ ও শুভকামনা প্রার্থী। অনাবশ্যক বিলাস-ব্যসনে অর্থের কোনরূপ অপব্যয় না করিয়া তাঁহারা যেন সর্ব-প্রকারে ভ্রাতৃপ্রতীম এই বীর জওয়ানদের সমরোপকরণ এবং অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের সরবরাহে সাহায্য করেন।

আজ আমি বোনেদের কাছে বীর জওয়ান ভাইদের তরফ হইতে

আবেদন জানাই সমস্ত ঐশ্বর্যের জন্য। ভারতমাতা আজ আক্রান্ত। জওয়ান ভাইরা বীরের মতন সীমান্ত অঞ্চলে আসামের পার্ব্বত্য ভূমিতে দেশরক্ষা করিতেছে দৃঢ়সংকল্প লইয়া। নওজওয়ানদের রসদ জোগাইতে হইবে আজ বাংলার ভগ্নীদের। ভাইফোঁটার পুণ্যদিনে আজ বাংলার ভগ্নীদের কাছে আমার আবেদন তাঁহারা যাহার যাহা আছে তাহাই দিয়া বীরজওয়ান ভাইদের উদ্দেশ্যে জয়তিলক দিন। —চাই স্বর্ণ। এই স্বর্ণ দিয়া আমাদের অস্ত্রশস্ত্র কিনিতে হইবে। যুদ্ধে জয় আমাদের সুনিশ্চিত। আমার বাসভবনে বোনেদের বীরজওয়ানদের সমরোপকরনের জন্য স্বর্ণের অপেক্ষায় আমি রহিব আগামীকল্য মঙ্গলবার সকাল ৭টা হইতে ১০টা পর্যন্ত।

জয় হিন্দ

কলিকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে ১৯৬২ সালের ২৯শে অক্টোবর প্রচারিত।

শান্তি ও যুদ্ধের সময় আঞ্চলিক বাহিনীর ভূমিকা

কয়েক সপ্তাহ আগে আঞ্চলিক বাহিনী ও জাতীয় সমরশিক্ষার্থী বাহিনী দিবস উপলক্ষে আমি দেশরক্ষার কাজে এই দু'টি বাহিনীর ভূমিকা সম্বন্ধে বলেছিলাম। আজ আমি আবার বিশেষভাবে আঞ্চলিক বাহিনী সম্বন্ধে আপনাদের কাছে কিছু বলার জন্য উপস্থিত হয়েছি।

ভারতের সীমান্ত এলাকায় পররাজ্যলোভী চীনের অতর্কিত আক্রমণে সারা দেশে যে আপৎকালীন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে মাতৃভূমির অখণ্ডতা, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে আমরা উপলব্ধি করেছি যে দেশের সর্বাঙ্গীণ আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও গড়ে তোলা দরকার।

স্বাধীন ভারতবর্ষ গান্ধীজী, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ চিন্তানায়কদের আদর্শ অনুসরণ ক'রে বারবার অহিংসা, সহাবস্থান ও শান্তিবাদের নীতিতে আস্থাজ্ঞাপন করে এসেছে। ভারতের অনুসৃত এই আদর্শ থেকেই রূপ নিয়েছে তার স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি। ভারতের এই নীতি পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রের সমর্থন পেলেও চীনের মতো নিরঙ্কুশ বলদর্পী রাষ্ট্রকে ভারতের বুকে অন্যায় আক্রমণ পরিচালনা থেকে নিরস্ত করতে পারেনি। তাই আজ শান্তিকামী হয়েও স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার জন্যে আমাদের ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতির পথে এগিয়ে যেতে হয়েছে। এই কর্মপ্রয়াসের পিছনে আছে স্বাধীনতাকামী ভারতের অগণিত নর-নারীর অকুণ্ঠ সমর্থন।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক বাহিনীর মতো প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের নিয়মিত বাহিনীকে শক্তিশালী ক'রে তোলার ব্যবস্থা তো সর্বপ্রযত্নে করা হচ্ছেই, সঙ্গে সঙ্গে দেশরক্ষার দ্বিতীয় স্তর হিসাবে আঞ্চলিক বাহিনীর যথোচিত শক্তিবৃদ্ধিও সরকারের লক্ষ্য। বর্তমান জরুরী অবস্থায় গুরুদায়িত্বপূর্ণ কর্মভার সাফল্যের সঙ্গে

বহন করে আঞ্চলিক বাহিনীর সদস্যরা আজ একথা প্রমাণ করেছেন যে, দেশরক্ষার কাজে তাঁরা গৌরবপর্ণ কৃতিত্বের অধিকারী। এই কৃতিত্বের জন্য আমি আঞ্চলিক বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আশা করি তাঁদের এই কৃতিত্ব দেশের আরও বহু নরনারীকে আঞ্চলিক বাহিনীতে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করবে।

আঞ্চলিক বাহিনী একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। আমাদের গৌরবের কথা এই যে, সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই আঞ্চলিক বাহিনীর সর্বাধিক সংখ্যক ইউনিট আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের এইসব ইউনিটের সকল পদ এখনও পূর্ণ হয়নি। আমি আশা করবো যে দেশবাসীরা অবিলম্বে এইসব শূন্যপদ পূর্ণ ক'রে পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক বাহিনীকে ভারতের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ক'রে তুলবেন।

আঞ্চলিক বাহিনীর আর এক নাম হ'ল নাগরিক বাহিনী। এবং এই নামের যথেষ্ট সার্থকতাও আছে। এই নাম থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই বাহিনীর সদস্যরা পেশা হিসাবে সৈনিক নন। তাঁরা আর দশজনের মতো অসামরিক নাগরিক এবং বিভিন্ন পেশায় কর্মরত। তফাৎ শুধু এই যে তাঁরা স্বেচ্ছায় অবসর সময়ে নাগরিক শিক্ষা গ্রহণ ক'রে দেশ-রক্ষার দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসেন। এদিক থেকে বিচার করেও একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হয় যে আঞ্চলিক বাহিনীর প্রত্যেক সদস্য এক একজন বড় দেশপ্রেমিক। তাঁরা দেশকে, জাতিকে, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রকে ভালবাসেন বলেই কোনপ্রকার বাধ্যতা না থাকলেও স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন দেশরক্ষার কাজে। তাঁরা কেউ হয়তো ডাক্তার, কেউ উকিল, কেউ সাধারণ কেরাণী, আবার কেউ বড় কর্মচারী। শান্তির সময় আঞ্চলিক বাহিনীর সদস্য হয়ে তাঁরা যে সামরিক শিক্ষালাভ করেন তাতে তাঁদের অসামরিক জীবনের পেশার কোন ক্ষতি হয় না। বরং যে সামরিক শিক্ষা তাঁরা পান তার ফলে তাঁদের চরিত্রের বিভিন্ন গুণ বিকাশের সহায়তা হয়। সামরিক জীবনের নিয়মশৃংখলা তাঁদের মনে দেশসেবার প্রেরণা এনে দেয়। আপৎকালে দেশরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণের শিক্ষাই শুধু তাঁরা পান না, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা হয়ে ওঠেন সৎ ও কর্মনিষ্ঠ। তাঁদের স্বাবলম্বনের শক্তি ও কর্মক্ষমতা বাড়ে। যাঁরা চাকুরীজীবী তাঁদের মালিকরাও এতে কম লাভবান হন না। জরুরী অবস্থায় আঞ্চলিক বাহিনীর সদস্যদের সামরিক কাজে নিযুক্ত করা হ'লে তাঁরা আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হন না এবং অসামরিক জীবনে নিজের পেশা বা চাকরিতে পরে ফিরে যাবার পূর্ণ অধিকার তাঁদের থাকে।

আঞ্চলিক বাহিনীতে সাধারণত ১৮ বৎসর থেকে ৩৫ বৎসর বয়সের যে কোন সুস্থদেহ নরনারী যোগ দিতে পারেন। যোগদানেচ্ছু লোকের অভাবও বড় একটা দেখা যায় না। তবে অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাচনপ্রার্থী হয়ে অনেককেই দৈহিক অপটুতার জন্য হতাশ হয়ে ফিরতে হয়। যাঁরা

আঞ্চলিক বাহিনীতে যোগ দিতে এগিয়ে আসবেন তাঁদের একথা ভুললে চলবে না যে নিয়মিত সেনাবাহিনীর মতো সামরিক শিক্ষাই তাঁদের দেওয়া হয়। সুতরাং সাধারণ সৈনিকের মতোই সর্বপ্রকার দৈহিকমান তাঁদের থাকা উচিত। দেহের ওজন, উচ্চতা প্রভৃতি যেমন বিবেচনা করা হয় তেমনি দেহ সর্বপ্রকার বিকৃতিবিহীন ও রোগমুক্ত হওয়া আবশ্যক। এইসব দিক ভালভাবে বিবেচনা না ক'রে নির্বাচনপ্রার্থী হ'লে অনেক-সময় অকারণে হতাশ হতে হয়। নিয়মিত বাহিনীর মতো আঞ্চলিক বাহিনীতেও ইন্‌ফ্যানট্রি, সিগ্‌ন্যালস্‌, অ্যাম্বুল্যান্স, অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ আছে। অকুশলী শ্রমিক থেকে সুদক্ষ যন্ত্রবিদ পর্যন্ত সকলেরই যোগ দেবার সমান সুযোগ আছে এই প্রতিষ্ঠানে। আঞ্চলিক বাহিনীর সদস্যগণ নিয়মিত বাহিনীর সৈন্যদের মতো প্রায় একই হারে বেতন পাবার অধিকারী। শিক্ষার কাল ও ফলাফলের ভিত্তিতে তাঁরা বার্ষিক ভাতা এবং পারিতোষিকও পান। সুখের কথা, পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক বাহিনীতে কিছুসংখ্যক মহিলা কর্মীও আছেন এবং তাঁরা প্রতি বৎসর পুরুষ সহযোগিদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা ক'রে পুরস্কার হিসাবে রাজ্যসরকার প্রদত্ত ঘড়ি উপহার পেয়ে আসছেন। দেশসেবা ও দেশরক্ষার কাজে আমাদের মা-বোনেরাও যে আজ পিছিয়ে নেই এ তারই আর একটি নিদর্শন।

আঞ্চলিক বাহিনীর বহু সদস্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। সরকারী কর্মচারীদের সামরিক শিক্ষালাভের সময় বিশেষ ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং সামরিক কাজে নিযুক্ত থাকার সময় তাঁদের পদমর্যাদা, বেতনাদি পুরোপুরি অক্ষুন্ন থাকে। কিছু কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেও অনুরূপ সুবিধাদি দেওয়া হয়। আমি আশা করবো যে সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকগণই তাঁদের প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক বাহিনীর সদস্যদের সমান সুবিধা দেবার ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করবেন। এতে আঞ্চলিক বাহিনীকে দৃঢ় ভিত্তিতে গঠনের সহায়তা যেমন হবে তেমনি এইসব প্রতিষ্ঠানের মালিকগণও দেশসেবার কাজে অংশীদার হবার গৌরব অর্জন করবেন। তাছাড়া তাঁদের প্রতিষ্ঠানের যেসব কর্মী আঞ্চলিক বাহিনীতে শিক্ষালাভের সুযোগ পাবেন তাঁরা হয়ে দাঁড়াবেন প্রতিষ্ঠানের সম্পদ বিশেষ। নিজেদের কর্মদক্ষতায় তাঁরা প্রতিষ্ঠানকে উত্তরোত্তর অগ্রগতির পথে এগিয়ে নেবেন।

পরিশেষে আমার আবেদন এই যে, আজ এই জাতীয় বিপদের সময় পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক বাহিনীকে দৃঢ়তম ভিত্তিতে গড়ে তোলার কাজে সকল দেশবাসীকে একযোগে এগিয়ে আসতে হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলাদেশ বরাবরই নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেছে, আজ দেশের স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা অক্ষুন্ন রাখার গুরুদায়িত্ব যখন আমাদের উপর এসে পড়েছে, তখন সে দায়িত্ব পালনেও বাঙলার যুবশক্তি পিছিয়ে পড়বে না এ বিশ্বাস আমার আছে। ভারতের মধ্যে আমরা

যেমন আঞ্চলিক বাহিনীর সর্বাধিক সংখ্যক ইউনিট পেয়েছি, তেমনি সর্বাধিক সংখ্যক সৈনিকও আমরা দেবো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যাঁরা সামরিক শিক্ষালাভের উপযুক্ত সক্ষম দেহ ও মনের অধিকারী তাঁরা দেশ ও জাতির এই বিপদের দিনে আঞ্চলিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ বাস্তবে পরিণত ক'রে তুলতে দ্বিধা করবেন না।

জয়হিন্দ

কলিকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে ১৯৬৩ সালের ১০ই জানুয়ারী প্রচারিত।

জনগণের সঙ্কল্পই আমাদের শক্তি

আজ আমাদের সাধারণতন্ত্র দিবসের উৎসব। প্রতি বৎসর এই দিনটিতে আমরা দেশের কাছে কি চেয়েছি এবং বিনিময়ে দেশকেই বা কি দিয়েছি সেই কথাই জানার চেষ্টা করে আসছি। এই দিনটি জন্মভূমি ও আমাদের স্বাধীনতার প্রয়োজনে নতুন করে আত্মোৎসর্গেরও দিন।

এই দিনে মাতৃভূমির প্রতি অধিকতর প্রেম ও সেবার জন্য এবং গঠনমূলক কার্যাদি অনুষ্ঠানের জন্য আমরা শপথ গ্রহণ করি। আমাদের চিন্তা ও কাজের দ্বারাই দেশকে আমরা গড়ে তুলি। এ বৎসর আমাদের কাছে দেশের দাবি কিছু বেশি, কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রও বটে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এখন প্রয়োজন কাজের ও কঠোর শ্রমের।

আজকের দিনে আমাদের ব্যর্থতা ও ভ্রান্তি, সাফল্য ও বিজয়ের কথা স্মরণ করতে বসে দেখতে পাই যে, আমাদের যা কিছু দোষত্রুটি ঘটে থাকুক না কেন আমাদের উত্তর সীমান্তে প্রচণ্ড আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামকালে আমাদের জনগণের আত্মিক বলের অভাব ঘটেনি।

দু'শ বছরেরও অধিককাল ধরে স্বাধীনতার জন্যে আমরা সংগ্রাম করেছি। আমরা সর্বদাই শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমরা যে একমাত্র সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম তা ছিল দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, অশিক্ষা আর অস্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে। আমাদের জনগণের জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে আমাদের আর্থনীতিক বনিয়াদ গড়ে তোলাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। ধরিত্রী মাতার নিকট থেকে জনগণের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য আহরণের উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ একর জমিতে জলসেচনের উদ্দেশ্যে আমরা নির্মাণ করেছি বিশালকায় বাঁধ ও ব্যারাজ। আমরা ইস্পাত কারখানা ও কল-কারখানা স্থাপন করে ভারী ভারী যন্ত্রপাতি, এঞ্জিন, বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি এবং এমন কী বিমানও তৈরী করেছি। শিল্প চালানোর জন্য তাপ-

বিদ্যুৎ এবং জল-বিদ্যুৎ উভয়প্রকার শক্তি উৎপাদক কারখানা আমরা স্থাপন করেছি। সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষার জন্য স্থাপন করেছি বহু বিদ্যালয়। আমরা রাস্তা ও সংযোগ সাধনের অন্যান্য ব্যবস্থা করেছি, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছি। আমাদের দেশবাসীরা যাতে আত্ম-প্রত্যয়শীল ও স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে সেজন্য সমবায় আন্দোলন ও পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার সম্প্রসারণ সাধন আমরা করেছি।

দেশ রক্ষার জন্যে প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠনের ব্যাপারেও আমাদের ঔদাসীন্য ছিল না। তবে আর্থনীতিক পুনরুজ্জীবনের উপরেই আমরা জোর দিয়েছিলাম বেশী। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সংগেই আমাদের সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়েছিল। এমন কি চীনের সংগেও আমাদের মিত্র সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সেই চীন সীমান্তবিরোধের যাবতীয় শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথ উপেক্ষা করে আমাদের দেশের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। কাজেই হানাদারদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে আমাদের অস্ত্রধারণ করতে হয়েছে। আমরা আমাদের বন্ধুদের সাহায্য গ্রহণ করে নিজেদের দেশে অস্ত্রশস্ত্রোৎপাদন বৃদ্ধি করেছি।

কোনো দেশের যথার্থ শক্তি যে তার স্থল, নৌ কিংবা বিমান-বাহিনীর উপর নির্ভর করে না সে কথা আমরা জানি। জনগণের সংকল্প ও আভ্যন্তরীণ সংস্থানই যথার্থ শক্তির উৎস। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, ইস্পাত ও বিদ্যুৎশক্তির উন্নয়ন ও দেশের বিভিন্ন প্রয়োজন সাধনের সাধারণ পরিপ্রেক্ষিত ব্যতীত বিচ্ছিন্নভাবে কোন শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব নয়। কারিগরী শিক্ষণপ্রাপ্ত প্রচুর কর্মীর প্রয়োজন আছে আমাদের এবং তার অর্থ হল সাধারণ এবং বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষা সম্প্রসারণ। আমাদের শক্তিশালী জাতি গঠন করতে হবে এবং তার অর্থ হল স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। আমাদের মৌল ও ভারী শিল্প গঠন করতে হবে। জনসাধারণের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে আমাদের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পকেও উৎসাহিত করতে হবে। আমাদের উৎপাদন পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যাতে তার ফলে আভ্যন্তরীণ চাহিদা নির্বাহ ছাড়াও আমরা রপ্তানীযোগ্য উদ্বৃত্তের অধিকারী হতে পারি ও রপ্তানির সাহায্যে সুদৃঢ় বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত গড়ে তুলতে পারি। জন ও উপকরণস্বরূপ যে সংস্থান আমাদের আছে তার সবকিছুর সার্থক বিনিয়োগ প্রয়োজন, কেননা অপচয়ের কোন অবকাশ আমাদের নেই।

আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি অনুসারে আমরা কাজ করে চলেছি। সম্প্রতি যে সব ঘটনা ঘটেছে তার ফলে এই কথাই বুঝতে পারা গেছে যে, আমাদের অগ্রাধিকার দেবার ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং সম্ভবত কিছু কিছু অনপরিহার্য বিষয় বর্জন করে কোন কোন দিকে অগ্রগতির ব্যবস্থা করতে হবে। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাদের এক নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং দেশ প্রয়ো-

জনের আহ্বানে যথোচিত সাড়াও দিয়েছে। আমরা দেখেছি যে আমাদের জনসাধারণ কর্তব্যসাধনে এবং দেশরক্ষায় বদ্ধপরিকর। ভবিষ্যতে কেউ আমাদের আক্রমণ করার কথা যাতে চিন্তাও না করতে পারে এই উদ্দেশ্যে আমাদের শক্তিবৃদ্ধি সুনিশ্চিত করতে হবে।

সাম্প্রতিক আক্রমণের ফলে দেখা গেছে যে, আমাদের দেশ সংঘবদ্ধ এবং অপপ্রযুক্ত রাজনীতির সাময়িক উত্তেজনা, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা কিংবা জাতিভেদ—কিছুই আমাদের ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে পারবে না। জাতি হিসাবে আমরা মহান—এ শুধু কথার কথা নয়—এটি খাঁটি সত্য। আমাদের জাতীয় ঐক্যবোধ সুদৃঢ়। মাটির উপরে আমাদের পা দৃঢ় নিবদ্ধ বলে যে কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর মত দৃঢ়তা আমাদের আছে।

শান্তি ও সৌহার্দ্যের যে আদর্শ আমরা অনুসরণ করে এসেছি কোনো অবস্থাতেই তা আমরা ত্যাগ করব না। যে সব শক্তি আমরা ন্যায়সংগত বলে মনে করি সেগুলির সহায়তা করা এবং অবাঞ্ছিত শক্তিকে অনুমোদন না করাই আমাদের সদর্থক নীতি। বিশ্বের ছোট বড় সকল দেশের সংগেই সহযোগিতা ও মিত্রতার সম্পর্ক আমরা রক্ষা করে চলব, কিন্তু কোন শক্তি বা গোষ্ঠীর জোটে যোগ দেব না। স্বাধীন জাতি হিসেবে কাজ করতে হলে ভারতকে তার নিজস্ব ভাবধারা ও পন্থানুসারে কাজ করতে হবে। তা'তে আমাদের ব্যর্থতা বা সাফল্য যাই আসুক তার জন্যে নিজেদের দুর্বলতা বা সামর্থ্যই দায়ী হবে—আর কিছু নয়।

স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে যাঁরা একদিন জীবনপণ করে স্বাধীনতার পথ সুগম করে দিয়ে গেছেন আজ তাঁদের কথাই স্বভাবত আমাদের মনে উদয় হয়। সীমান্ত এলাকায় যে সকল জওয়ান দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় ব্যাপৃত, আমাদের প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টাকে সমর্থনের উদ্দেশ্যে ও ভারতকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য মাঠে মাঠে ও কারখানায় যাঁরা কাজ করে চলেছেন তাঁদের কথাও আমরা ভুলতে পারি না।

স্বাধীনতা এক পবিত্র আলোকবর্তিকা এবং তা শাশ্বত আত্মার মূর্ত প্রকাশ। প্রতিটি অন্তরে আস্থা ও সাহসের সঞ্চার সাধনের জন্যে যে হাত সে আলোকবর্তিকা উর্ধ্বে তুলে ধরবে এবং তাকে অম্লান ও উজ্জ্বল রাখবে সে হাতকেও হতে হবে শক্তিশালী।

সাম্প্রতিক আক্রমণের পূর্বে ও পরে ভারতের অবস্থা অনেকটা অপ্রজ্জ্বলিত এবং প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের মত। এই প্রদীপের শোভার অন্ত নেই। এই দীপ আজ প্রজ্জ্বলিত হয়ে আমাদের আলোকদানের যথার্থ

কর্তব্য সম্পাদন করছে। এই আলোকে আমরা স্বাধীনতার এক নবীন উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ করেছি—সে উদ্দেশ্য হ'ল স্বাধীনতার সংরক্ষণ।

২৬শে জানুয়ারী সাধারনতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুবাদ।

নবজীবনের অন্যান্য গ্রন্থ

ভারত ও তাহার ভবিষ্যৎ—শ্রীঅরবিন্দ

(শ্রীঅরবিন্দের দেশাত্মবোধক রচনা সংগ্রহ ও কয়েকটি ভবিষ্যৎ বাণী)

পত্রালী—অতুল্য ঘোষ

(কয়েকটি চিঠির মাধ্যমে অপরূপ সাহিত্য স্বষ্টি)